স্বপ্নের কাছাকাছি

এ এক আশ্চর্য স্বপ্নকথা, যেখানে কল্পনা ও বাস্তব মিলেমিশে যায়। ছুঁয়ে যায় সকলের মন, কিন্তু ছোঁয়া যায় না স্বপ্ন। নস্ট্রালজিয়ায় ভারাক্রান্ত সৌমেন মিত্র-র কলম।

আঁকা শেখানো মানেই যে একটা ‘মাছ ধরছে, দূরে আকাশ, কালো বর্ডার’ সিনারি নয় সেটা আঁকার শিক্ষকরা না বুঝলে কে বুঝবে বল্ তো?

এই প্রসঙ্গে আমার আঁকা শেখার কথা তোকে বলতে ইচ্ছে হচ্ছে। আমার যখন বয়স তিন, তখন আমার জ্যেঠু হাত ধরে পাড়ার আঁকার স্কুলে ভর্তি করে দিয়েছিলো। একটা পুরোনো বাড়ি, স্যাঁতসেঁতে ঘর, আট-দশজন দাদা দিদি বসে বসে আঁকছে, কাগজ প্যাস্টেল রঙতুলির সেই আশ্চর্য সুন্দর গন্ধ আমি এখনো পাই। প্রথম দিন আমি একটা বেড়াল এঁকেছিলাম। ভেবেছিলাম বেড়াল আঁকছি, কিন্তু লাইন-এর এমন দশা যে ওটা হাবিজাবি ছাড়া কিছু ছিল না। দুজন দিদিমনি ছিলেন। একজন বললেন, ‘বাহ্, বেশ হয়েছে। পরের দিন আমরা ফলের ঝোড়া আঁকবো। তুমি বাড়িতে, বাজারে ভালো করে সব ফল দেখবে।’ তো যাইহোক, সেই আঁকা স্কুলের নাম ছিল ‘আলেখ্য’। খুব সুন্দর নাম। আমার একটা ঝোলা ব্যাগ ছিল। সেখানে কাগজ, পেনসিল, রঙ, রাবার সব থাকতো। আমি আঁকতে খুব ভালোবাসতাম। এই স্কুলটায় আমি ক্লাস থ্রি অবধি শিখেছি। তখন কিন্তু পুরোনো বাড়িতে আঁকা শেখানো হতোনা। একটা নতুন বাড়ির ম্যাজেনাইন ফ্লোরে শেখানো হতো। বেশ লাগতো। ম্যাজেনাইন ফ্লোরের উচ্চতা কম হয়। সেখানে বেশ একটা আরামদায়ক অনুভূতি আসতো। অনেকে আঁকতে যেতো সেখানে। ওখানেই প্রথম জলরঙ শিখেছি আমি। টিউব কালার ... দিদিমণিরা যা শেখাতেন তাই শিখতাম। সেই সময়ে মনে পড়ে একজনকে চাইনিজ ইঙ্ক দিয়ে আঁকতে দেখেছিলাম। ব্যাস, অমনি আমার লোভ হয়েছিলো আমিও আঁকবো। চাইনিজ ইঙ্ক কেনা হলো, কলম কেনা হলো, তার সাথে কয়েকটা নিব্। কি ভালো যে লাগতো কালো কালি দিয়ে স্কেচ করতে। ক্লাস টু বা থ্রি-তে আমি তখন অন্যদের তুলনায় ভালো আঁকতে শিখেছি। সবাই প্রশংসাও করছে। আর আমি কেবল স্কেচ আঁকছি ...।

আমাদের এখানে খুব বসে আঁকো প্রতিযোগিতার চল ছিল। সময়টা বলছি ১৯৮২-৮৫। আমি আলেখ্যতে আঁকা শিখছি, আর সেখানকার বুলুদা আমাদের বিভিন্ন জায়গায় পাঠাচ্ছে। আমি খুবই ছোটো বলে আমাদের বিভাগ ‘ক’। সেখানে যেমন খুশি আঁকো।

মাস্টারমশাই ও দিদিমণিরা যেমন শিখিয়েছেন, ছেলেমেয়েরা ঠিক তেমন তেমন এঁকে দিচ্ছে। একটা অদ্ভুত ব্যাপার দেখতাম, যারা যে ছবিই আঁকছে, তার বাইরে একটা করে কালো বর্ডার দিচ্ছে এটা আমার ভালো লাগতো না। আর আমার জীবনের প্রথম ছবি আঁকা প্রতিযোগিতার ছবিটা নিজের মত অনুযায়ী এঁকেছিলাম। এঁকে কিছু হয়নি, দিদিমণি সামান্য বিরক্ত হয়েছিলেন, কিন্তু আমি খুশি হয়েছিলাম একটা কথা ভেবেই যে আমি 'নিজের খুশি মতো আঁকো' ব্যাপারটার মর্যাদা রাখতে পেরেছি। কিন্তু জানিস, ক্লাস থ্রি থেকে ওই স্কুলটার ওপর আমার একটা অনিহা আসতে থাকে। সেটা একদিকে যেমন 'পুশ ফ্যাক্টর', অন্যদিকে একটা 'পুল ফ্যাক্টর' কাজ করছিল।

'পুশ ফ্যাক্টর'টা ছিল এই যে, আমি কিছুই শিখছিলাম না। বরং বেশ বিরক্তি আসছিল। আর 'পুল ফ্যাক্টর'টা ছিল এই যে, আমি যেখানে আঁকার প্রতিযোগিতায় যেতাম, সেখানে সেখানে কোনো একটা আঁকার স্কুল থেকে এসে ছেলেমেয়েরা সব প্রাইজ জিতে নিয়ে যেত। আমি তাজ্জব হয়ে যেতাম ওদের আঁকা দেখে। কি ছোটো কি বড়ো, সবাই এতো সুন্দর আঁকে। ওদের মুখ দেখে মনে হতো ওরা যেন আঁকতে আঁকতে স্বর্গসুখ ভোগ করছে। আমার ব্যাগ্র চোখ বার বার সেই ছেলেমেয়েদের আঁকার দিকে চলে যেত। আমি ঠায় দাঁড়িয়ে দেখতাম ওরা কিভাবে আঁকছে। একজনকে তো দেখেছিলাম, পেনসিল দিয়ে হাল্কা একটা এঁকে নেবার পরে আর্ট পেপার সোজা নিয়ে গিয়ে টিউবওয়েল-এর তলায় ধরতে। অর্থাৎ সে ছোকরা আর্ট পেপারটা স্নান করিয়ে দিলো। আমিতো তাজ্জব হয়ে গেলাম, এ কি রে বাবা! তারপরেই দৌড়ে এসে ছেলেটা সামান্য জল ঝরিয়ে বিভিন্ন রঙ ডিপ্ করে করে ছড়িয়ে দিতে লাগলো, লাল, নীল, হলুদ, খয়েরি ... নানারকম। তারপর কাগজটা একদিকে হেলিয়ে দিয়েই অনেকটা রঙ গড়িয়ে গড়িয়ে পড়ে গেল। আমি আবার তাজ্জব বনে গেলাম। সে একটা অস্বাভাবিক সুন্দর গোধুলির দৃশ্য এঁকে ফেলেছে!

(২)

এরকম ভাবেই আমার আঁকার দিন কাটতে লাগলো। আমি প্রায় প্রতি রবিবারই এখানে সেখানে প্রতিযোগিতায় যাই, আর ওই ছেলেদের আঁকা দেখি। ওরকম করতে করতে জানতে পারলাম ওরা নির্মলদার কাছে আঁকা শেখে। এমন যিনি মানুষ, তাঁকে তো দেখতে হবে। আমি ব্যাগ্র হয়ে পরলাম, কে এই নির্মলদা! আমার সুযোগ জুটলো একদিন এরকমই একটা প্রতিযোগিতায়। ওনার ছাত্রছাত্রীরা বলাবলি করছিল, আজ নির্মলদা আসবেন। আর আমিও তো ওদের কাছাকাছি বসতাম। প্রতিযোগিতা সাধারণত হতো কোনো একটা ক্লাবের মাঠে। সেখানে রোববার সকাল আটটায় যেতে বলা হতো।

প্রতিযোগিতা শুরু হত প্রায় ন'টায়, ঢিলেঢালাভাবে নাম ডাকতে ডাকতে। সবাইকে নির্দেশ দেওয়া হতো কি করতে হবে। মাঠে একটা বড়ো ত্রিপল পাতা থাকতো। মাঠের বাইরে বাঁশ দিয়ে বানানো রেলিং। সেখানে সব অভিভাবকরা উন্মুখ হয়ে দাঁড়িয়ে আছেন। আঁকা শুরু হবার আগেই ফার্স্ট প্রাইজ ঘোষণা হয়ে গেছে এমন একটা মুখ নিয়ে সব মা বাবা। আমার ভাগ্য খুব ভালো যে আমার মা বা বাবা জীবনে কখনো এইরকম প্রতিযোগিতায় যায়নি। আমিও স্বস্তি পেয়েছি। তো সেদিন, প্রতিযোগিতা শুরু হতেই আমি একটা ছেলেকে বলছি, 'এই নির্মলদা কখন আসবেন রে?' সে ওনার কাছে আঁকা শিখতো। তার নাম তমাল। কয়েকটা প্রতিযোগিতায় যাওয়ার পর তার সাথে আমার একটু চেনা হয়ে গেছিলো। সে প্রায় নীরব মুখে এঁকে চলেছে। তাকে বার দুয়েক জিজ্ঞেস করার পর মুখ না তুলেই বললো, 'আসবেন কোনো একটা সময়ে।' আমি ওকে বললাম, 'আলাপ করিয়ে দিবি?' ও কিছু বললো না। কিছু পরে, অভিভাবকদের মধ্যে থেকেই একটা ছোট্টো শোরগোল উঠলো, এই তো নির্মলদা এসেছেন, এই তো।

তো শেষমেশ আমি ওনাকে দেখলাম। ছয়ফুট লম্বা, রোগা, শ্যামবর্ণ, মুখে চাপদাড়ি, আকাশী-নীল পাঞ্জাবি, সাদা চোস্ত, আঙুলে একটা রিং ঝকঝক করছে, আর একটা গগলস্। নির্মল মুখার্জী। ও হ্যাঁ, হাতে সিগারেট। আমি ওনাকে দেখলাম। দেখে আমার কিশোর মন আহ্লাদে আটখানা হয়ে গেল। আমি দূর থেকে ওনাকে দেখতেই লাগলাম। সেদিন আর ভালো করে আঁকতেই পারলাম না। আর হ্যাঁ, সেই তমালের থেকে ওনার বাড়ির ঠিকানা নিয়ে নিলাম। আমাদের বাড়ি থেকে হেঁটে গেলে প্রায় কুড়ি মিনিট লাগবে। ওখানে ভ্যানিস কালীতলা বলে একটা জায়গা আছে। সেখানে।

বাড়ি এসে বললাম জ্যেঠুকে। 'আমি অন্য জায়গায় আঁকা শিখবো।' জ্যেঠু বললো, 'কোথায়?' আমি বললাম, 'সবাই নির্মলদার কাছে আঁকা শিখে ফার্স্ট সেকেণ্ড হয়, আমিও শিখবো।' জ্যেঠু কিন্তু আর কোনো প্রশ্ন করলো না। তুই হয়তো অবাক হবি, আমি বাবা মা থাকতে জ্যেঠুকে বললাম কেন। তাহলে বলি, বাবা আমার পড়াশোনাটাই দেখতো শুধু। বাকি এক্সট্রা কারিকুলার অ্যাক্টিভিটি সব জ্যেঠুর তত্ত্বাবধানে হতো। তো, জ্যেঠু আর আমি সেই রোববারই বিকেলের দিকে বেরোলাম নির্মলদার বাড়ি যাবো বলে।

এদিকে একটা চাপা উত্তেজনা আমার মধ্যে কাজ করছে। কতরকম ভাবছি। উনি আমায় নেবেন না। উনি এখন বাড়িতে নেই। উনি আমার আঁকা দেখতে চাইবেন। যতো সব উদ্ভট চিন্তা করতে করতে আমি আর জ্যেঠু এগোচ্ছি। আমি তখন ক্লাস ফাইভ। এমন কিছু বড়োও না। আবার মনে মনে ছোটোও নই।

তো লোককে জিজ্ঞেস করতে করতে আমি যেখানে এসে দাঁড়ালাম, আমার চক্ষু বিস্ফোরিত হয়ে গেল!! চারপাশে সব দারুন দারুন বাড়ি, আর তার মাঝে একটা একতলা প্রায় মাটির বাড়ি। বাড়ির গা দিয়ে একটা নারকোল গাছ উঠেছে। বাইরে নীল রঙের একটা

গ্রিল। একটা ছোট্টো বোর্ড-এ লেখা আছে 'প্ল্যান্টিং আর্ট সেন্টার'। ছাদের বদলে টালি। একটা দাড়িওয়ালা বুড়ো লোক গ্রিলের সামনে দাঁড়িয়ে আছে। রাস্তায় বেশ কয়েকটা সাইকেল। এই বাড়ি ওনার? উনি আর্টিস্ট? আমার যেন কেমন একটু লাগতে লাগলো। পোষাক দেখে তো সকালে মনে হলো না! ঠিক জায়গায় এলাম তো? এইসব ভাবছি। আর আমার জ্যেঠু ততক্ষণে জিজ্ঞেস করে ফেলেছে ওই বুড়ো কে, 'এটা কি নির্মল মুখার্জীর বাড়ি?

বুড়ো ভদ্রলোক এবার ভেতরে একটা ডাক দিলেন। কি নাম ধরে সেটা আজ আমার মনে নেই, বুড়ো-টুড়ো কিছু একটা হবে। কিছু পড়েই নির্মলদা বেরিয়ে এলেন। আমার যেন ভগবানকে দেখার অবস্থা। ওই ছোটোবেলার কথা ভাবলে আজও ভালো লাগে। কেমন দুমদাম অবাক হতাম। নির্মলদা বেড়িয়ে আসতে জ্যেঠু বললেন, 'আমি শিবপুর ট্রাম ডিপোর কাছ থেকে আসছি। এ আমার ভাইপো, আপনার কাছে আঁকা শিখতে চায়।' শুনে উনি আমার দিকে এক মুহূর্ত তাকালেন, তারপর বললেন, 'আয়'...। আয়, আয়, আয়, আয় ... ওই একটা ডাক আমার সব ভাবনা দূর করে দিলো। আয়। এসো বা আসুন বললেন না, বললেন, আয়। আমি তো প্রায় হুরমুড় করে ঢুকে পড়ি ঘরে।

একটা নীল রঙের ঘর। মাটি মাটি গন্ধ। ওপরটা চালা। একটা ফ্যান বনবন্ করে ঘুরছে। কয়েকটা বড় বড় দাদা-দিদি বসে বসে একটা সত্যিকার খুলি দেখে আঁকছে। স্টিল লাইফ। আমি ওদের আঁকা দেখে পাগল হয়ে গেলাম। আলেখ্য তো এদের ধারে কাছে আসবে না! ঠিক যেন বিদেশী বই দেখছি। আমি চারিদিকে তাকালাম। ওই ঘর দিয়ে আর একটা ঘর, ভেতরে যাওয়া যায়। মানে ভেতরে আর একটা ঘর আছে। সেটা সেই মুহূর্তে আমার কাছে অজানাই রইল। উনি বেশ গম্ভীর স্বরে আমাকে বললেন, 'বোস্'।

বোস্ মানে মাটিতে। কোনো শতরঞ্চি বা মাদুরও পাতা নেই। লাল মেঝে। পাখা আর টিউব। আমি আমার ঝোলা নিয়ে ভাইভা দেওয়ার মতো বসলাম। আমি এক দেওয়ালে পিঠ দিয়ে, উনি উল্টো দিকের দেওয়ালে পিঠ দিয়ে। ওনার দুটো পা আমার দিকে করা। একটা পাঞ্জাবি, সাদা প্যান্ট। সেই একই মূর্তি। আমাকে বললেন, 'সকালে আমার দিকে ড্যাব ড্যাব করে চেয়েছিলি কেন?' আমি তো থ্। উনি আমাকে দেখেছেন! একটা পুটকি ছেলে ওনার দিকে চেয়ে আছে। আমি আবার আশ্চর্য হয়ে গেলাম। তারপর সত্যি কথাটাই বললাম। 'আমি লোভে পড়ে এসেছি'। ওনার কোনো ভাবান্তর হলো না। উনি একটা সিগারেট ধরালেন।

আমি তড়িঘড়ি করে আমার আঁকা বের করতে গেলাম। উনি বললেন, 'থাক থাক'। তারপর একটা ধোঁয়ার রিং ছেড়ে আমাকে বলতে শুরু করলেন, 'দ্যাখ, এটা আমার ভাত-বৃত্তি (এখনো ওই শব্দটা আমার কানে বাজে, ভাত-বৃত্তি)। আমি এখানে রোজ আঁকা শেখাই। তবে তুই তো স্কুলে পড়িস। তোর বোধহয় শনি বা রোববার আসতে পারলে ভালো

হবে।' আমি বললাম, 'হ্যাঁ, হ্যাঁ, রোববার, রোববার'। তখন উনি বললেন, 'দ্যাখ, আমার এখানে আঁকা শেখার একটা নিয়ম আছে। আমি কিন্তু মারধোর করি। বল্।' এই বল্-টা আমায় নয়, পাশের একটা দাদাকে। সে তখন মুচকি হেসে চুপ করে গেল। উনি বললেন, 'আমি কিন্তু কান ধরে ওঠবোশ করাই, আঁকা না করে আনলে বাইরে বের করে দিই। আঁকা নিয়ে ছেলেখেলা আমি বরদাস্ত করি না। তুই ভেবে আসিস।

আমি তো তখন পাগল। আমি বললাম, 'না না, আমি আসবই'। আমি জীবনে কখনো মার খাইনি। আর আমি কিননা বলছি, মারলেও আসব। হয়তো মনে মনে একটা বোধ হচ্ছিল যে আমি মার খেতেই পারিনা। অথবা, মারলেও, প্রতিযোগিতায় ফার্স্ট প্রাইজ আমার চাই। কি মনে হচ্ছিল, তা এখন বলা সম্ভব নয়।

তো, উনি আমাকে বললেন, 'একটা ফর্ম দিচ্ছি, সেটা ভরে দে।' আমি দেখলাম। দুটো ফর্ম। একটা ফর্ম-এ আমার নাম, বাবার নাম, স্কুল, বয়স এইসব লেখার জায়গা। অন্যটায় রঙের নাম। ওই রঙের নামের লিস্ট দেখিয়ে আমাকে বললেন, 'এই রঙগুলোর নাম জানিস? আমি তো সজোরে বলে দিলাম, 'হ্যাঁ'। উনি বললেন, 'বল তো'। সত্যিরে, আমি গড়গড় করে সব বলে দিলাম – মানে, ক্রিমসন রেড, ভার্মিলিয়ন রেড, প্রুসিয়ান ব্লু, কোবাল্ট ব্লু, ভিরিডিয়ান গ্রীন, ক্রোম গ্রীন এইরকম। উনি খুশি হয়ে গেলেন, খুব খুশি। একটা ক্লাস ফোর-ফাইভের ছেলে সবকটা রঙের নাম বলে দিয়েছে।

তারপর উনি আমায় বললেন, 'রোববার আমার দুটো ব্যাচ। একটা দুপুরে, একটা বিকেলে। দুপুরেরটায় একটু বড়রা আসে। আর তোর মতো ছেলেমেয়েরা বিকেলে। যদি একবছর আঁকার পর দেখি ভালো উন্নতি হয়েছে, তাহলে, দুপুরের ব্যাচ-এ সিফ্ট করা হবে। ঠিক আছে?' আর আমি!! সে সব শুনে, তক্ষুনি নিজেকে দুপুরের ব্যাচ-এ সিফ্ট করে নিয়েছি, বড়দের সাথে আমিও আঁকছি।

কিন্তু একটা খটকা লেগে গেল। দুপুরের ব্যাচ, আবার বিকেলের ব্যাচ! মাত্র দুটো ব্যাচ। আলেখ্যতে তো সকাল আটটা থেকে ন'টা একটা ব্যাচ, ন'টা থেকে দশটা, দশটা থেকে এগারোটা, এগারোটা থেকে বারোটা, বারোটা থেকে একটা, মানে পাঁচটা ব্যাচ সকালেই হয়ে যেতো। আমি ওনাকে জিজ্ঞেস করলাম, বিকেলের ব্যাচটা কটা থেকে শুরু? উনি যা বললেন, তাতে আমার মাথাটা ঘুরে গেল।

(৩)

আমি ওনার উত্তর শুনে ছিটকে গেলাম। উনি বললেন, 'আমাদের এখানে কিন্তু তিন ঘন্টা করে ক্লাস হয়।' তিন ঘ-অ-ন-টা? আমি বিশ্বাস করতে পারছিলাম না। আমার মনের মধ্যে নানান রঙের ঘন্টা বাজছিল।

আলেখ্যতে একঘন্টা আঁকা শিখে আমার মন ভরতো না। বসতে বসতেই যেন সময় শেষ হয়ে যেত। আমি চাঁদ পেলাম। খুব খুশি হয়ে বললাম, 'আপনি যতক্ষণ শেখাবেন আমি ততক্ষণ শিখবো।' তখন উনি বললেন, 'ঠিক আছে। সামনের সপ্তাহ থেকে বিকেল পাঁচটায় এসো। পাঁচটা থেকে আটটা। আর বড়দের দুটো থেকে পাঁচটা।

আমার ওখান থেকে একটুও উঠতে ইচ্ছে করছিল না। উনি তখন জ্যেঠুকে একটু হ্রস্ব স্বরে বললেন, 'আমার মাইনে মাসে কুড়ি টাকা।' আলেখ্যতে নিত পনেরো টাকা। জ্যেঠু বললো, 'ঠিক আছে। আমি এসে দিয়ে যাব।' জ্যেঠু আমাকে বলল, 'চলো'। আর আমার মন পড়ে আছে স্টিল লাইফের দিকে। আশ্চর্য সুন্দর সব ছবি। একটা খুলি আঁকছে। কিন্তু কি অপূর্ব। আমার মনে হচ্ছে, আমার আর্ট কলেজে পড়া উচিৎ।

জ্যেঠু বুঝলো আমি বসতে চাইছি। আমাকে বলল, 'ঠিক আছে, তুমি কিছুক্ষণ থাকো, আমি আসছি। নির্মলবাবু, আপনার আপত্তি নেই তো, ও এখানে থাকলে?' তখন মনে হয় সাড়ে চারটে বাজে। জ্যেঠু উঠে গেল কোথাও একটা। হয়তো আমাকে একটু শ্বাস ফেলার অবকাশ দিতে। আমি একমনে দেখছিলাম।

আমি এবার আঁকা ছাড়াও ঘরের দিকে তাকাই। দেওয়ালে কয়েকটা বড়ো ছবি ঝুলছে। জলরঙ। ওনার আঁকা ল্যান্ডস্কেপ। একটা ভোরের সূর্য, একটা রাস্তা, জঙ্গল মতো, লাইট পোস্ট, দু-একটা লোক হেঁটে যাচ্ছে, একটা দুটো মুরগি, ছাগল ... খুব আধো স্বরে আঁকা। কেউ কাউকে ছাপিয়ে যাচ্ছে না। আমি আঁকাটার দিকে অপলকে তাকিয়ে রইলাম। আমার মনে হল, আমি কি অমন আঁকতে পারি না? পারি, পারি, পারি। আমিও পারবো। নির্মলদা আমাকে কিছুই বললেন না, উঠে গেলেন।

এবার আমি একটু মুক্ত হয়ে পাশের একজন দাদাকে জিজ্ঞেস করলাম, 'দাদা, তোমার নাম কি?' সে মুখ না তুলে বলল, 'রুদ্র, তোর?' আমিও বললাম। আমি এটা সেটা জিজ্ঞেস করতে লাগলাম। আর সে অবজ্ঞাভরে উত্তর দিতে লাগল। বাকি ছেলেমেয়েরাও নিজেদের মধ্যে হাসি-মস্করা করছে। ওদের কথা শুনছি। আমাকে কেউ দলে নিচ্ছে না। আমার সম্পর্কে কোনো আলোচনাও করছে না। শুধু আঁকতে আঁকতে এ ওর পিছনে লাগছে। কথায় কথায় ওরা বলছিল, সামনের রোববার ব্রিজের ধারে, ব্রিজের ধারে। কি রে বাবা। ব্রিজের ধারে কেন যাবে? আরো কিছুক্ষণ মন দিয়ে শোনার পর বুঝলাম, নির্মলদা ওদের দল বেঁধে বাইরে নিয়ে যান ল্যান্ডস্কেপ আঁকা শেখানোর জন্য। আমার যে সেসব শুনে নিজেকে থাপ্পড় মারতে ইচ্ছে হচ্ছিল। কেন যে এখানে আগে আসিনি!

সাত পাঁচ ভাবছি। শুনি বাইরে জ্যেঠুর গলা।

জ্যেঠু ঠিক কি বলছে সেটা শোনা যাচ্ছে না, কিন্তু কথাটা নির্মলদার সাথেই বলছে। তারপরই দরজা খুলে নির্মলদা ঘরে ঢুকলেন। আমাকে বললেন, 'তোর জ্যেঠু তোকে আটটার সময় নিতে আসবে। তুই আজ থেকেই শুরু করে দে।'

আমার তখন আনন্দে মরে যেতে ইচ্ছে করছিল। লাফাতে ইচ্ছে করছিল। চ্যাঁচাতে ইচ্ছে করছিল। কোনোটাই করতে পারলাম না। একটা খাতা এনেছিলাম, সেটা খুললাম। নতুন খাতা। নির্মলদা বললেন, 'আমায় দে'।

আমি খাতা এগিয়ে দিতেই উনি নিজের পকেট থেকে একটা নিব্ পেন তুললেন। দেখলাম, সোনালি রঙের নিব্। বডিটা কালো। ঝকঝক করছে। যেন রাজার কলম। আমি বিশ্বাস করতে পারছিলাম না। উনি ওই পেনটা আমার খাতায় ঠেকালেন, একটুও তুললেন না। অত্যন্ত দ্রুততায় একটা ফিগার এঁকে ফেললেন। আমি দেখলাম। বাউল। আমার আবার মরে যেতে ইচ্ছে করছিল।

আমায় বললেন, 'যা খুশি আঁক।' আমি বললাম, 'খুলিটা আঁকবো?' উত্তর এলো, 'না। অন্য কিছু।' আমি তখন একটা ল্যান্ডস্কেপ আঁকতে শুরু করলাম। ছোটোবেলায় আমি আঁকতে শুরু করলে আমার বাহ্যজ্ঞান থাকত না। তাই হলো, আঁকতেই থাকছিলাম। অবশ্য আমার হাত আর কত ভালো হবে! আমি আলেখ্যতে যা শিখেছিলাম সেটাই আঁকছিলাম। ততক্ষণে পাঁচটা বেজে গেছে। বড় ছেলে মেয়েরা উঠে পড়েছে। সবাই 'নির্মলদা আসছি' বলে বেরিয়ে যাচ্ছে। আর সাথে সাথে ছোটোদের ব্যাচ, মানে আমাদের ব্যাচের ছেলেমেয়েরা ঢুকছে। কাউকেই চিনি না। এরকম পাঁচ-সাতজন ঢোকার পর একটা মেয়ে ঢুকলো। সে ঢুকেই আমাকে বলল, 'কি রে তুই?' আমিও অবাক হয়ে বললাম, 'তুই?' তার নাম রঞ্জনা। সে আমাকে বলল, 'তুই আজ ভর্তি হলি? আমি আগের রোববার ভর্তি হয়েছি।' ভালোই হল। একজন চেনা পাওয়া গেল।

ছোটো থেকে কো-এডুকেশন স্কুলে পড়ার দরুন আমার ছেলে মেয়ে বিভেদ কম। তাই বন্ধুত্বের মধ্যে কোনো জেন্ডার আমি মানি না। যার আমার সাথে খাপ খায় সেই বন্ধু।

সবাই বসে গেল, সবাই খাতা বার করছে, আমিও এঁকে যাচ্ছি। জলরঙ করব বলে উঠেছি। একজন বলে দিলো কোথায় কল আছে জল পাওয়া যাবে। জলের ছোট্টো বাটিটা নিয়ে উঠে বাইরে বেরোতে নির্মলদার বাড়িটা ভালো করে দেখতে পেলাম। একেবারে শতচ্ছিন্ন, হতদরিদ্র অবস্থা। ভেতরে আর একটা ঘরে কয়েকজন সিনেমা দেখছে। তখন রোববার বিকেলে বাংলা না হিন্দী কিছু একটা সিনেমা হতো। আমি সেই ঘরের সামনে রাখা একটা ড্রাম থেকে জল নিয়ে এসে আবার আঁকতে শুরু করলাম।

তার পনেরো কুড়ি মিনিট পর নির্মলদা আবার ঢুকলেন। একটা ছেলেকে বললেন, 'নরেন, তোর বাড়ির কাজ হয়েছে?' সে বলল, 'হয়নি'। নির্মলদা বললেন, 'উঠে দাঁড়া'। সে উঠল না। ভয়ানক একটা গলা করে এবার উনি বললেন,'উ-ঠে-দাঁ-ড়া'। নরেন ভয়ে ভয়ে উঠলো। উনি বললেন, 'কান ধর'। সে কান ধরল। বললেন, 'ওঠ-বস কর কুড়িটা।' আমার তো হাত পা শুকিয়ে গেছে ততক্ষণে। আঁকাও প্রায় শেষ। একটা ল্যান্ডস্কেপ এঁকেছি। ওই মাঠ-ঘাট গোছের কিছু একটা। কয়েকটা লোক। একটুও ভালো হয়নি সেটা। বিদঘুটে

লাগছিল। কি আশ্চর্য, আমার মন যা চাইছে আমার হাত সেটা করতেই পারছে না! লজ্জায় আমি বেগুনি হয়ে যাচ্ছিলাম। ওদিকে নরেন ওঠ-বস করছে। কেউ কেউ দেখছে। নির্মলদা বললেন, 'তোর বাবাকে ডেকে দিবি। কথা বলব। তোকে এখানে আসতে হবে না।'

আমাকেও যদি বলে, তোর বাবাকে ডেকে দিবি। আসতে হবে না তোকে। আমি তো সেদিন বাড়িই ফিরবো না! এবার উনি আমার দিকে ঘুরে বললেন, 'এঁকেছিস?' আমি ওই আধা ভেজা খাতাটা সাবধানে এগিয়ে দিলাম। উনি সেটা দেখতে লাগলেন।

(৪)

ল্যান্ডস্কেপটা উনি দেখছেন। মন দিয়ে। আমি দুরু দুরু বুকে অপেক্ষা করছি কি বলেন। মোটা ফ্রেমের চশমার ফাঁক দিয়ে চোখ তুলে আমাকে বললেন, 'কাঁচা ভিরিডিয়ান মেরে দিয়েছিস?' আমি তো থতমত। হ্যাঁ না হ্যাঁ না করছি, কি বলতে চাইছে বুঝছি না। উনি বললেন, 'কাঁচা ভিরিডিয়ান সরাসরি কখনো দিবি না, একটু ইয়েলো অকার মিশিয়ে দিবি, নইলে, ক্যাঁটকেটে হয়ে যায়। শোন' – বলে মভ গ্রীন, মুজ্ গ্রীন, সী গ্রীন – কতরকমের গ্রীন হয় সেগুলো বোঝালেন। আর একটা চৌকো বাক্স থেকে বড় বড় টিউব বের করে সব দেখালেন। আমি ওই বড় বড় টিউব দেখে লোভে লালায়িত হয়ে গেছি তখন। আগে তো দেখিনি। উনি সব কটা গ্রীন একটু একটু নিয়ে প্যালেটে ফেলে রঙ গুলো বোঝাতে লাগলেন। লেমন ইয়েলোর সাথে ক্রোম গ্রীন দিলে কি হয়। গাছে একদিকে আমি শিখেছিলাম হলুদ দিতে, অন্যদিকে গ্রীন। কী রকম যেন নুন-মরিচ টাইপ লাগতো। উনি ধীরে ধীরে আমার খাতার পাতায় তুলির আঁচড় টানতে লাগলেন। আর সবুজের হাজার একটা শেড তৈরি করতে লাগলেন। আমি মুগ্ধ হয়ে গেলাম।

জ্যেঠু ঠিক সময়ে নিতে এসে দেখি হাসছে। আমি তো খুশি খুশি মুখ করে আছি। জ্যেঠু আমার মন পড়তে পারতো খুব। আমি রেডি হয়ে 'নির্মলদা আসছি' বললাম। আমার মনে ধ্বণিত হতে লাগলো, 'নির্মলদা আসছি'। এতদিন যেটার জন্য উদগ্রীব হয়েছিলাম, সেটা আমি পেয়েছি। আর ওনাকে দাদা বলার সুযোগও পেয়েছি। আমি আর জ্যেঠু ফিরছি। জ্যেঠু অবশ্য আঁকা-টাকা তেমন বুঝতেন না। অন্তত উনি বোঝেন কিনা সেটা আমি কোনোদিন বুঝিনি। রাস্তা অন্ধকার, কোথাও লাইট জ্বলছে, দোকানপাট আস্তে আস্তে উঠে পড়ছে। আমি আর জ্যেঠু হেঁটে হেঁটে ফিরছি। আমার কাঁধে ঝোলা ব্যাগ। আমি খুশিতে চুরমার হয়ে যাচ্ছি। আমার মাথায় শুধু সবুজ আর সবুজ ...।

ভাবছি, কি কি শিখলাম আজ? এক তো কলম না তুলে কিভাবে পেন দিয়ে স্কেচ করতে হয় (আজও আমি স্কেচ প্রিয়)। আর সবুজের সমারোহ কিভাবে করতে হয়। বার

বার ভাবছি, এবার আমার হাত আমার হৃদয়ের কথা শুনবে তো? আলেখ্যর সব বন্ধুদের বলতে ইচ্ছে হচ্ছিল, ওরে তোরা আমার সাথে শিখবি আয়, আয়, আয়, এমনটা পাবি না।

সাত-পাঁচ ভাবতে ভাবতে আমি ফিরলাম বাড়ি। ঠাকুমা বলল, 'হলো'? মা বলল, 'কেমন শেখান রে?' বাবা কিছু বলল না। কারণ বাবা তখন বিধ্বস্ত। নিজের কাজের জায়গা নিয়ে। নানান ঝঞ্ঝাট, রোববারেও ছুটি মিলত না।

সেই রোববারটাও তেমনি একটা দিন ছিল। উত্তাল ঝামেলা ঝঞ্ঝাটের পর বাবা বাড়িতে ফিরেছিল। আর ওই জামা কাপড় পড়েই বিছানায় শুয়েছিল চোখের ওপর হাত রেখে। আমি কি বলব, কিছুই বলতে পারছিলাম না। শুধু বললাম, 'আমি আজ নির্মলদার কাছে প্রথম আঁকলাম। তুমি আঁকাটা পরে দেখো। এখন রেস্ট নাও।' বাবা কিছুই বলল না। মাথাও তুলল না। আমি ঘর থেকে চলে এলাম। একদিকে সাংসারিক পরিস্থিতি ভয়ানক, অন্যদিকে আমার আঁকার ইচ্ছে, দুটোই একসাথে গঙ্গা যমুনা স্রোতের মতো মিশতে লাগলো। গঙ্গার ঘোলা জল আর যমুনার কালো জল। এই দুই স্রোতের মিলনে আমি শুদ্ধ হতে লাগলাম।

রাতে খাওয়া হল। আমার একটা টেবিল ল্যাম্প ছিল। সেটা জ্যেঠু কিনে দিয়েছিল। টেবিল ল্যাম্পের আলো আমার কাছে একটা স্বপ্নের মতো ছিল। কালো একটা ঢাকনার মধ্যে থেকে গলানো সোনার মতো হলুদ আলো বের হয়ে আসছে। ঠিক যেইখানে আমি চাইছি, ঠিক সেইখানে সে পড়ছে। সারা ঘর অন্ধকার। সেই টেবিল ল্যাম্প জ্বাললাম। আমি বরাবর ঠাকুমার কাছে শুতাম। ঠাকুমা বিছানায় শুয়ে পড়লো। আমি ঘন লাল মেঝেতে বসলাম টেবিল ল্যাম্প জ্বালিয়ে। ল্যাম্পটা কিছুটা খাটের নিচে ঢুকিয়ে দিলাম। আর আমার খাতাটা খুললাম। ওই বাউলের পাতাটা। দেখতেই থাকলাম। শুধু বাউল। আমার হাতের লেখা বেশ ভালো ছিল ওই বয়সে। আমি নিজেও বল পেন-এ লিখতে পছন্দ করতাম না। নিব্ পেন-এ লিখতাম। তবে সেটা ছিল নীল কালির। হঠাৎ করে আমার সেই খয়েরি রঙের নিব্ পেনটা খুব ভালো লাগতে শুরু করল। পেনটা অজস্রবার আমি হাতে ধরেছি। রোজ সকাল বিকেল লিখি। কালি শুষে নিয়ে হাতের তর্জনী মধ্যমায় ভরে যায়। কিন্তু ওই একই পেন নিয়ে অবাক হওয়া আমার প্রথম। যেন একটা নিষ্পাপ শিশু আমার হাতে। প্রেমময় ঈশ্বর আমার হাতে। এবার আমি পেনসিল ছাড়াই ওই কলমটা দিয়ে সাদা পাতায় রেখা টানা শুরু করলাম। ঠিক নির্মলদার কায়দায়। পেনের নিব্ যেন কাগজ না ছাড়ে, এইভাবে।

রাত তখন দশটা বেজে গেছে। ১৯৮৫ সালের রাত দশটা মানে অনেক। টিভি নেই, রেডিও নেই, কি লোভে মানুষ বসে থাকবে? তাই সাড়ে নটায় খাওয়া আর দশটার মধ্যে বিছানায়। আমি কিন্তু হলুদ আলোর শঙ্কুর মধ্যে বসে বসে নীল কালি বুলিয়ে যাচ্ছি। একটা কুড়েঘর, পিছনে কলাগাছ, নারকেল গাছ, কুড়েঘরটা বেশ একটা উঁচু মতন জায়গায় বসে আছে, দরজার সামনে থেকে একটা রাস্তা নিচের দিকে নেমে এসেছে, একটা ছোটো পুকুরের

পাশ দিয়ে রাস্তাটা চলে এসেছে। পুকুরে ওই কুড়ে আর গাছের ছায়া দেখা যাচ্ছে। আমি এঁকেই চলেছি। আমার মনে তখন একতারা বেজে চলেছে। সবাই ঘুমে আচ্ছন্ন। আমার তর্জনী ও মধ্যমা নীলে নীলময়। আর আমার সাদা পাতায় অদ্ভুত এক মায়া তৈরি হয়ে চলেছে। সেই অদৃশ্য সুর ছবি মিশে এক অনির্বচনীয় আনন্দ। হুঁশবিহীন আমি থামছি। যখন থামলাম, আমার ছবি শেষ হয়েছে। আমার সাথে মায়ায় জড়িয়ে গেছে সেই ছবি। আমরা কেউ আর আলাদা নই। গুরুর উদ্দেশ্যে তাঁর অনুপস্থিতিতে আমার প্রথম গুরুদক্ষিণা।

হঠাৎ, পিছনের জানালা দিয়ে একটা বাক্য, 'বাহ্, ভালো হয়েছে।'

(৫)

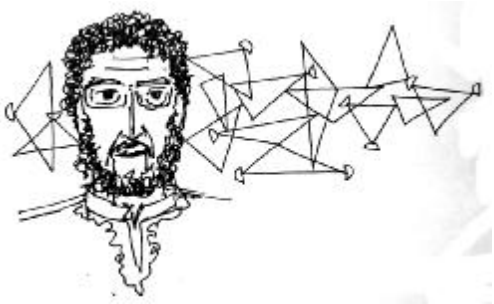

অন্ধকারে চমকে ওঠারই কথা। কে? দেখি বাবা। হয়ত রাতে কোনো কারণে উঠেছিল টয়লেট যাওয়ার জন্য। দালানের জানালা দিয়ে দেখেছে ঘরে আলো জ্বলছে। অতো বিধ্বস্ত অবস্থাতেও ওনার খেয়াল আছে ছেলেটা আজ ছবি আঁকা শিখে এসেছে প্রথম।

মনের এক সমুদ্র জল নিয়ে খেলা করতে করতে আমি ঘুমোবার চেষ্টা করি। কিন্তু ঘুম আসেনা কিছুতেই। এমনি ভাবেই হয় ভোর। সোমবার। আমার মধ্যে একটা অদ্ভুত পরিবর্তন। আমার চারদিকটা ছবিময় হয়ে গেছে। মনে হচ্ছে দেওয়াল থেকে, বিছানা থেকে, মাটি থেকে, খাবার থেকে, সব জায়গা থেকে এই বুঝি রঙ গড়িয়ে পড়লো, আর আমি জল নিয়ে সেসব রঙ দিয়ে আলপনা বুনে চলেছি। পুরোটাই যেন মতিভ্রম।

ছবি নিয়ে আমার পাগলপনা শুরু হল এবার। স্কুল যাচ্ছি, ফিরছি, সব পড়াও করছি, খাচ্ছি, কিন্তু মন ছবির দিকে। উফ্, রোববার আসতে এত দেরি কেন? ভাবতে ভাবতেই আমি খাতা ভরিয়ে ফেলেছি। কত কিছু। সবই স্কেচ, পেনসিল দিয়ে, পেন দিয়ে।

আবার এল রোববার।

আমার তখন মন বসে গেছে প্ল্যান্টিং আর্ট সেন্টার-এ। শুক্রবার থেকেই ভাবনার তোড়জোড় শুরু হয়। আর শনিবার হলেই বুকের ধুকপুকানি বেড়ে যায়। কখন রোববার বিকেল চারটে বাজবে। এখন আর কাউকে দিয়ে আসতে হয় না। আমি নিজে চলে যাই। গিয়ে একটু অপেক্ষা করতে হয়, আধ ঘন্টা মতো। তারপর আমার ব্যাচের ছেলেমেয়েরা আসে। কিন্তু ওদের সাথে আঁকতে আমার একটুও ভালো লাগেনা। বরং আগের ব্যাচটা আমায় টানে। তাই কিছু আগে চলে গিয়ে ওদের ছবি দেখি। প্রথম দু-একদিন বাইরে

দাঁড়িয়ে ছিলাম। নির্মলদা আমার আগ্রহ দেখে আমাকে ভেতরে বসার অনুমতি দিয়েছেন। আমি ওদের জলরঙ দেখি, ওদের তুলি চালানো আমায় মুগ্ধ করে। অনেকের সাথে আমার ভালো আলাপ হয়ে গেছে। রুদ্রদা, অয়নদা, বিটুদি, টুম্পাদি, কমলদা, বিশুদা, রবিদা, এরকম অনেকে। মন দিয়ে লক্ষ্য করলে ওদের ধাঁচা গুলো বোঝা যায়। রুদ্র ও অয়নদা জলরঙ করতে খুব ভালোবাসে। টুম্পা ও বিটুদি পেনসিল স্কেচ। কমলদাটা একটু পাকা আছে। সে ক্যাঁটকেটে লাল রঙ দিয়ে মোনোক্রোম করতে ভালোবাসে। তা লাল ভালোবাসিস বাস না, কিন্তু ওই ক্রিমসন রেড দিয়ে মোনোক্রোম করার কি আছে বাপু? একটু তো স্কারলেট বা অকার মেশাতে পারিস, যাতে চোখে কম লাগে? এইজন্য সে বকুনিও কম খায় না। নির্মলদা একদিন আমার সামনেই তাকে ভয়ানক বকলেন। সে আবার একটু গাঁত-ও ছিল। মুখটা গোমরা করে রাগ দেখিয়ে সে উঠে গেল, বাইরে গিয়ে ঝং ঝং আওয়াজ করতে করতে সাইকেলটা নিয়ে জোরে বেরিয়ে গেল। নির্মলদা বলল, 'ব্যাটার বহুত পাখনা হয়েছে।' এসব আমার সামনেই হচ্ছে। আমিও দেখছি, উপভোগ করছি।

আর একটা কথা বলি। নির্মলদা কোনোদিন আমাদের ব্যাচ-এ কোনো ছবির বই বের করত না। হয়ত আমরা বুঝবো না, তাই। কিন্তু ওদের ব্যাচ-এ দারুন দারুন সব বিদেশি বই বের করতো। সিরিজের নামটা এখন একেবারে ভুলে গেছি। প্রত্যেকটা বইয়ের দাম চল্লিশ পঞ্চাশ টাকা, ১৯৮৫ সালে। আমাদের তুলনায় বেশ বেশি। কিন্তু আমি অবাক হয়ে যেতাম ঐসব বই দেখে। কোনোটায় শুধু বেড়াল আঁকা, কোনোটায় শুধুই নানারকম গাছ, কোনোটায় জলরঙ কিভাবে করতে হয়, কোনোটা আবার অ্যানাটমি ও ন্যুড স্টাডি। ন্যুড স্টাডি দেখে আমার কৈশোরজনিত কোনো লালা ঝরতো না। বরং বিভিন্ন পস্চারের জন্য হাড় কিভাবে কাজ করে সেগুলো শিখতাম। কেউ হাসলে তার চোখ ছোটো হয়ে যায়, হাতের মুঠো কিভাবে আঁকতে হয়, কেউ দৌড়ালে তার স্কেলিটন্ কেমন হয়, কোনো মেয়ে ঘাড় ঘুরিয়ে তাকালে হাড়ের মুভমেন্ট কেমন হয়, মুখের মধ্যে কান, চোখ, ঠোঁট এগুলোর অনুপাত কিভাবে হয় এসব দেখতে আমার বেশ লাগতো। তার চেয়েও বেশি, একটা বইতে দেখেছিলাম পারস্পেক্টিভ ড্রয়িং – ওয়ান পয়েন্ট টু পয়েন্ট। কোন জায়গা থেকে দেখলে কেমন দেখায়। এখন বুঝতে পারি, আর্কিটেকচারে ঢুকে আমার অন্য বন্ধুদের পারস্পেক্টিভ বুঝতে ও শিখতে গলদঘর্ম হয়ে যেতে হতো, সেখানে আমি হাসতে হাসতে অবলীলায় পারস্পেক্টিভ নামিয়ে দিতাম। একদিকে অঙ্কের প্রতি শ্রদ্ধা, অন্যদিকে অঙ্কণের প্রতি ভালোবাসা – এই দুটোই আমার আর্কিটেকচার গাছের বীজ অনেক অনেক আগেই পুঁতে দিয়েছিল মনের মাটিতে।

আমার ব্যাচ একদিন শেষ হয়েছে। নির্মলদা বাইরে সিগারেট খাচ্ছে, আর একজনের গলা শুনতে পেলাম। চেনা চেনা লাগলো গলাটা।

(৬)

নির্মলদা একদিন বিকেলে একগোছা ফর্ম এনে বললেন, ‘সামনের রোববার সকালে প্রতিযোগিতা আছে। বিশ্ব কল্যাণ সংঘ। ফর্মটা ফিল্ আপ করে দে। এন্ট্রি ফি দুই টাকা। সবাই এখানে চলে আসবি, আমরা একসাথে যাব।’ আমরা ফর্ম ফিল্ আপ করলাম। আর বলতে দ্বিধা নেই, খুব আনন্দ হলো আমার, আমি ফার্স্ট হলাম। ওটা আমার দ্বিতীয় গুরুদক্ষিণা। তবে ফার্স্ট সেকেন্ড হলে নির্মলদার কিছুই যায় আসতো না। বরং কিছু না হতে পারলে উনি একটু মনোক্ষুণ্ন হতেন। আমার মনে হয়েছে, সব ভালোর মধ্যে এটাই ওনার একটা সমস্যা ছিল। বড্ড বেশি পজিশন, নাম, যশ আঁকড়াতে চাইতেন।

এইভাবে চলছে, চলছে। উনি কতকিছু টেকনিক শেখাচ্ছেন। আমাদের বলছেন, ‘তোরা পুরোনো খবরের কাগজের উপর সিক্স বি পেনসিল দিয়ে নানান ধরণের লাইন আঁকতে থাকবি, বিভিন্ন দিকে, যাতে হাত সেট্ হয়, হাতের আড় ভাঙে। যতক্ষণ না কাগজটা ছিঁড়ে যায়, করতে থাক। তারপর হাতের বিভিন্ন জয়েন্ট দেখিয়ে শেখাচ্ছেন কিভাবে পেনসিল ধরতে হয়, পেনসিল কাটতে হয়। সে এক অদ্ভুত জিনিস। স্কেচ করার সময় উনি পেনসিলের মুখ থেকে প্রায় তিন ইঞ্চি দূরে একটা রাবার ব্যন্ড আটকে দিতেন আর বলতেন, ‘এর ভেতরে যেন আঙুল না যায়।’ প্রথম প্রথম সবারই অস্বস্তি হতো। উনি কয়েকটা ছেলেকে বেদম পিটিয়ে দিতেন। আমি বুঝতাম, স্কেচের সময় উনি চান না হাতের ওপর প্রেসার বাড়ুক। আমার অভ্যাস হয়ে গেল বিভিন্ন রকম ভাবে পেনসিল ধরতে। আর পেনসিল কাটা? ওটাও একটা দারুন কায়দা। ধীরে ধীরে ওটাও রপ্ত করে নিয়েছি। হাতে এইচ পেনসিল দেখলে উনি ছুঁড়ে ফেলে দিতেন। ‘উজবুক কোথাকার।’

কিন্তু যাই হোক, একটা ব্যাপারে আমার একটু খারাপ লাগা থেকেই যাচ্ছে। উনি কিছুতেই আমাকে একদিনও বড়োদের গ্রুপে ডাকছেন না। আমিতো আপ্রাণ চেষ্টা করছি। কতরকম টেকনিকে ড্রয়িং করছি। আমার সহপাঠিরা বলছে ভালো। কিন্তু ওনার মুখে রা নেই কোনো। ভালোও বলেন না, মন্দও বলেন না। তবে আমার বাবার সাথে ওনার ভালো আলাপ হয়ে গেছে। বাবা ইদানিং মাঝে মাঝে রাতে আমায় নিতে আসে। সেই ফাঁকে একটু সিগারেট দেওয়া নেওয়া হয়। দু-চার কথা হয়। বাবাই ওনাকে মাইনে দেন। আর আমি ঝোলা নিয়ে এঁকেই যাই। আর ভাবি, উনি বড়োদের গ্রুপে ডাকবেন।

অপেক্ষা করতে করতে আমি বিরক্ত। একদিন যাবার পথে ওনাকে বলেই ফেললাম, ‘নির্মলদা, আমি দুপুর দুটোয় আসতে চাই। বাড়িতেও তো কোনো কাজ নেই। বারোটা একটার মধ্যে খাওয়া হয়ে যায়। আমি অতক্ষণ কি করবো?’ উনি আমার দিকে স্থির চোখে তাকিয়ে। বললেন, ‘ঠিক আছে আয় সামনের দিন।’ আমি আনন্দে আত্মহারা হয়ে গেলাম।

আমার লোভ, আমি বই দেখবো। পরের সপ্তাহেই আমার অভিষেক হলো বড়োদের ব্যাচে। আর আমি প্রথম একটা ফুলদানির স্টিল লাইফ করার সুযোগ পেলাম। দেখলাম, বিটুদি অসম্ভব ভালো ও দ্রুতগামী। বাকিরা ওর কাছে স্পিড-এ পাত্তাই পাচ্ছে না। নির্মলদা ওই দুপুর দুটোর সময় এক কাপ চা নিয়ে বসেছেন। হাসছেন, মস্করা করছেন। বিটুদির পিছনে লাগছেন, 'কি রে বিটু, তোর তো ফুল ফুটলো না।' বিটু ইলেভেন টুয়েলভ্-এ পড়তো। কপট রাগ দেখিয়ে সে বলছে, 'কি যা-তা কথা আপনার।' উনি নিজের মুখেই আলতু-ফালতু জোক্ বলছেন ওদের। কিন্তু একটু আদিরসাত্মক। আর তার মধ্যেই দ্রুতহাতে চলছে স্টিল লাইফ। আর ওনার বাজপাখির চোখ সবার ছবির দিকে। অয়নদা একটু চুপচাপ। রুদ্রদাও। কিন্তু ওরা দুজনে ফিসফাস করে। রুদ্রদা বয়সে একটু বড়ো। টেন-এ পড়ে, অয়নদা নাইন-এ। আর আমি সিক্স-এ। ওই সময়ে ক্লাস দিয়ে বয়স মাপা হতো। রবিদা মোটা, খালি ঘামে। নির্মলদা বলছেন, 'কি রে রবি, তোর তো জলই লাগে না। গায়ে তুলিটা বুলিয়ে নিলেই তো হলো।' রবিও মস্তান মস্তান গলায়, 'কি যে বলেন না আপনি, গায়ে বুলিয়ে নিলেই হলো!' নির্মলদা হাসছেন, 'কত রঙ হয়ে যাবে তোর গায়ে, বল্ রবি।' রবি ঘামছে, হাত ভিজে যাচ্ছে, ছবি খারাপ হয়ে যাচ্ছে। কমলদা একটু সখি সখি টাইপের। সে মেয়েদের মতো বসে, কিরকম করে যেন। লাল টি-শার্ট পড়ে আসে। কালো প্যান্ট। পা দুটো সরু সরু। মাথায় ঝাঁকড়া চুল। অতি ফরসা। ওকে চট্ করে দেখলে জেন্ডার বোঝা যায় না। আর নির্মলদাও যা-তা বলেন। এই প্রথম বুঝলাম, ওই ব্যাচটা নির্মলদার একটা শ্বাস ফেলার জায়গা। বসে থাকেন, নিজের মতো আঁকেন, গল্প করেন, টেকনিক বলেন, আর ওনার বোন বা মা এসে মাঝে মাঝে একটা বিচ্ছিরি ছোট্টো কাপে চা দিয়ে যায়। বোনের যথেষ্ট বয়স হয়েছে, কিন্তু ফ্রক পড়ে থাকে, নাকে নাকছাবি। কি অস্বস্তিকর দেখতে লাগে কি বলবো। মায়ের মাথাটা একটুও সাদা বা কালো নয়। পুরোটাই লাল। ধ্যাবড়া করে সিঁদুর পড়েন। চা দিয়ে পাশের ঘরে চলে যান। মাঝে মাঝে বাবা মা বোনের ঝগড়া কানে আসে। খুব খারাপ ভাষায় ওনারা ঝগড়া করেন। নির্মলদা নির্বিকার। কাকে যে বলে এগুলো বুঝতাম না। পরে শুনেছি, বুঝেছি সব। ওগুলো নির্মলদাকে উদ্দেশ্য করে ছুঁড়ে মারেন। আমি অবাক হয়ে যাই। আমার কৈশোর জীবনে ধীরে ধীরে স্বপ্নগুলো কঠিন বাস্তবের আকারধারণ করতে থাকে। কিন্তু আমি এঁকেই যাই।

আরো একটা আনন্দের খবর আছে আমার। আমি এখন আঁকার প্রতিযোগিতায় প্রথম দ্বিতীয় হই। পুরস্কার পাই। কোথাও শিল্ড, কোথাও সার্টিফিকেট, এইসব। আর আরো একটা খবর। আমি প্রতি রোববার এখন দুপুর দুটোয় আঁকা শিখতে যাই, আটটা অব্দি থাকি। ছয় ঘন্টা! আমার জীবন সার্থক হয়ে গেছে। আর বুঝি নির্মলদা আর্থিক চাপে জর্জরিত। কিন্তু আমারো ওনাকে চল্লিশ টাকা দেবার ক্ষমতা নেই। মনের দুঃখে আমি কুড়ি টাকা দিই, ও আফশোস করি, ইস্ আমি যদি রোজগার করতাম, আমি চল্লিশ টাকা দিতাম।

রাত আটটা বাজলে ফুরফুরে হাওয়ার মধ্যে আলো অন্ধকারে রাস্তায় হেঁটে আমি বাড়ি ফিরছি একদিন। আমি একা থাকলে আনমনে গান গাই। সেইরকম ভাবে গান গাইতে গাইতে ফিরে বাড়িতে ঢুকতে যাচ্ছি, দেখি বুলুদা।

(৭)

বুলুদা এসেছেন। আমার তো সত্যি একটু ধুকপুকুনি লাগছে। অনেকদিন হয়ে গেল, আমি আলেখ্যতে যাই না। ওনাকে বলিওনি যে ছেড়ে দিয়েছি। অথচ আঁকার ব্যাগ নিয়ে ফিরছি। বুলুদা হতাশার চোখে বলল, 'কি রে আর আসছিস না কেন?' কিছুই বলতে পারছিনা আমি। আবার জিজ্ঞাসা। আমি বাধ্য হয়ে বললাম, 'অন্য জায়গায় ভর্তি হয়েছি।' বুলুদা অবাক হয়ে গেল। হয়ত এটা উনি কল্পনাই করতে পারেননি। আসলে উনি তেমন কিছুই করেন না। বাচ্চাদের নিয়ে থাকেন। সেই বুলুদা নিজের হাতে বাচ্চাদের গড়েন ওনার সাধ্য অনুযায়ী। আর সেই আমি তিন বছর থেকে আঁকা শিখে প্রায় সাত বছরের মাথায় দুম করে ছেড়ে দিলাম, এটায় উনি আহত। উনি বললেন, 'আচ্ছা ঠিক আছে।' চলে গেলেন। আমারও খারাপ লাগায় মন ভরে গেল।

পরের রবিবার নির্মলদা আমাকে বললেন, 'আজ তোদের পাড়ার ওদিকে যাবো। তুই আমার সাথেই চলে যাবি।' আঁকা শেষ করে ওনার সাইকেলের রডে আমাকে নিয়ে উনি বেরোলেন, আমার বেশ একটা গর্ব গর্ব হচ্ছে। আমি বললাম, 'চলুন না আমাদের বাড়ি।' সাইকেল চালাতে চালাতেই বললেন, 'আচ্ছা চল্। পাঁচ মিনিট বসবো।' আমি তো বাড়িতে ঢুকেই চিৎকার করে বলছি, 'দ্যাখো, নির্মলদা এসেছেন।' আমি সাধারণত চিৎকার করি না। কিন্তু পরিস্থিতি আমাকে চিৎকার করাতে বাধ্য করলো। বাবা বলল, 'আসুন আসুন।' আমি জ্যেঠুর ঘরে নিয়ে বসালাম। জ্যেঠুর ঘরে তখন তাসের আড্ডা বসতো। সেখানেই নির্মলদা বসলেন। এখন ভাবি আর হাসি পায়। কত সাদামাটা মন ছিল আমার। অনেকেই বলবে, আঁকার স্যার এসেছে, অতো চিল্লানোর কি আছে? আছে আছে ভাই, আছে। আমার যে কি ভালো লাগছে, তা যদি বোঝাতে পারতাম। নির্মলদা প্রায় আধাঘন্টা বসলেন, চা-বিস্কুট খেলেন, মিস্টিও খেলেন। তারপর সবার সঙ্গে গল্প করে চলে গেলেন। সে দিনটা আমি ভুলব না। বাড়িতে বললেন, 'আপনাদের ছেলে ভালোই করছে।'

কিছুদিন পর থেকেই একটা বিভ্রাট শুরু হতে লাগল। আমরা বসে আছি, নির্মলদা নেই। আসছেন, কিন্তু একটু দেরি করে। বিশুদা আমাদের ছোটোদের ব্যাচে আঁকা শেখাচ্ছেন। আর বড়োদের ব্যাচ অভিভাবকহীন। দেরিতে আসছেন, বিধ্বস্ত। কী যে হয়েছে ওনার কে জানে। ছোটোদের অতো ঔৎসুক্য নেই। বড়োরা ফিসফিস করে। রুদ্রদা,

অয়নদাকে বলছে, 'স্যারের বউটা পাঁজির পাঝাড়া।' বউ? আমিতো ওভারহিয়ার করেছি। স্যারের বউ? স্যার বিয়ে করেছেন? কই, বাড়িতে তো দেখিনা? অয়নদা ওদের তুলনায় একটু ছোটো। ওকে জিজ্ঞেস করতে ও একটু চুপ করে স্বগতোক্তির মতো বলল, 'হ্যাঁ রে, স্যার বড়োলোকের মেয়েকে বিয়ে করেছেন। বনিবনা হয় না বাড়ির সাথে। তাই অন্য একটা বাড়িতে বউ আর মেয়ে থাকে।' মেয়ে? আমি তো আরো আশ্চর্য! মেয়ে আছে? অয়নদা বলছে, 'বউ এখানে আসে না। স্যার ওই ভাড়াবাড়িতে যায়। এই তো একটু দূরে থাকে।' আমি তো আশ্চর্য। বড়োরা সব জানে! আমি প্রায় দেড় বছর আঁকা শিখেও জানিনা। যাই হোক, নির্মলদার অবস্থা ভেবে আমার কষ্ট হতে লাগল। একে টাকা পয়সার সমস্যা, তায় বউ বড়োলোকের মেয়ে, বাবা মা প্রায় অথর্ব, বোনের বিয়ে হয়নি, নিজের ছোটো মেয়ে। উফ্, কী অসহায় অবস্থার মধ্যে দিয়ে উনি চালিয়ে যাচ্ছেন।

তারপর কেন জানিনা, আমার স্বপ্নের দুনিয়া বাস্তবের একটা বাড়ি খেয়ে একটু নেতিয়ে গেল। তাবে আঁকার উৎসাহ কমল না। আমি এইট-এ উঠলাম। ভালো ভালো ছবির বই দেখছি, কত কায়দা শিখছি। কিন্তু এবার আমি নিজেই অসুবিধার মধ্যে পড়ে গেলাম।

আমি আর কন্টিনিউ করতে পারছি না। তিন বছর ধরে শিখছি এখানে। কতকিছু শেখার বাকি আছে। কিন্তু কোথা থেকে এক অস্থির মন আমাকে কুঁড়ে কুঁড়ে খাচ্ছে। একবার গান গাইছি, একবার ছবি আঁকছি, কখনো উদাস হয়ে যাচ্ছি, কিছুই ভালো লাগছে না, নানান রকম খেলা চলছে মনের মধ্যে, যেগুলো আদৌ কোনো সুফল দিচ্ছে না আমায়। বাড়িতে তখন ভয়াবহ অবস্থা। আর্থিক ও সামাজিক, সব স্তরেই বিভীষিকা। সম্পর্কের টানাপোড়েন চলছে। কত রকম অসম্মান, অবমাননা চলছে। ওই তেরো চৌদ্দ বছর বয়সে এসব দেখে আমার মন বিষিয়ে যাচ্ছে ধীরে ধীরে। একথা কেউ ভাবছে না। বাবা ভাবতে পারলেও, সেই মুহূর্তে ওনার মন ও বুদ্ধি একসাথে কাজ করছে না। মা চুড়ান্ত অবহেলিত। বাইরের মানুষজন খুব সহজে বুঝে যাচ্ছে এদের পরিবারে নানান ফাটল আছে। সুযোগসন্ধানীরা সেই ফাটল ব্যবহার করছে। আমি, ছোট্টো একটা মানুষ, রাতের পর রাত ডাইরি লিখছি। ওইরকম ভয়াবহ পরিবেশ অতিক্রম করে জীবনযুদ্ধে নামা আমার পক্ষে কিছুতেই সম্ভব হচ্ছে না। তাই নির্মলদা আমার জীবন থেকে ধীরে ধীরে আবছা হয়ে যাচ্ছেন। এতো উচ্ছাস, এতো আবেগ, সব সাফ হয়ে যাচ্ছে ধুয়ে মুছে। আমি ক্রমশ তলিয়ে যাচ্ছি কোনো এক অজানা কুয়োর মধ্যে, যেখানে শুধুই অন্ধকার। প্রত্যেকদিন আমার ভোর হচ্ছে বাস্তবের লাঠির আঘাতে। আমি আপ্রাণ চাইছি সহজ সরল হয়ে থাকতে, পারছি না। কোনো আনন্দ নেই আমার জীবনে।

তিন-চার মাস টাকা বাকি পড়ে গেছে নির্মলদার কাছে। যাচ্ছি কোনোমতে ওনার কাছে। টেনে টেনে। বলছি, 'নির্মলদা, সামনের মাসে সব একসাথে দিয়ে দেব।' একসাথে

আশি-একশ টাকার বিলাসিতা আমার তখন নেই। রেফারেন্স বই নেই বলে, বইয়ের দোকানের হারুদা নতুন বই খবরের কাগজের মলাট দিয়ে আমাকে দেয়, বলে, 'তুই লিখে টিখে আমায় দিয়ে যাস্।' কোনটা প্রাধান্য দেবো? পড়াশোনা না আঁকা? আমার দারিদ্র্য আমাকে বেত মেরে মেরে বুঝিয়ে দিয়েছে, 'তোর বাবা মা-কে যেমন হেনস্তার শিকার হতে হচ্ছে সমাজের কাছে, তুইও কি তাই চাস?' একদিকে আমার প্যাশন, অন্যদিকে বাস্তব। আমি বাস্তবটাই বেছে নিলাম। ছেড়ে দিলাম আঁকার স্কুল। আমার সাধের ছবি, প্রণম্য নির্মলদা সবের উপর জোর করে করে ধুলোবালি ছড়িয়ে দিলাম। 'প্ল্যান্টিং আর্ট সেন্টার' আমার কাছে বন্ধ হয়ে গেল।

(৮)

স্কেচ খাতা, রঙ-তুলি, পেনসিল এদের ওপর ধুলো জমে যাচ্ছে। আমি বিভ্রান্ত। বিভিন্ন রকম আবেগ আমাকে দুমড়ে দিচ্ছে। নির্মলদা ধীরে ধীরে হারিয়ে যাচ্ছেন আমার দুনিয়া থেকে। পড়াশোনা আর বাড়ির জটিলতা নিয়ে থাকছি। কোনো গুরু নেই আমার। পাগলদের মতো উচাটন হয় আমার। আমার ক্লাস এইট থেকে নাইন টেন এ উঠে যাচ্ছি ধাক্কা খেতে খেতে।

নির্মলদা শুধু আমার কাছে একটা সিনেমার মতো হয়ে রইলেন। একদা এক বাঘের গলায় হাড় ফুটিয়াছিল-র মতো। হাড়টা নিজের নিয়মে ক্ষয় হতে লাগলো। আমি সেভাবে আঁকা ছেড়ে দিলাম। কিন্তু নির্মলদা আমার আর্কিটেকচারের বীজটা ঠিক জায়গায় পুঁতে দিয়ে গেলেন। ওনার সাথে সমস্ত রকম যোগাযোগ আমার ছিন্ন হলো। আমি সব ভুলে গেলাম। মাধ্যমিক হয়ে গেল, অত্যন্ত দ্রুতভাবে উচ্চমাধ্যমিকও হলো। জয়েন্টও হলো। আমি আর্কিটেকচারে ভর্তি হলাম আমার স্কেচ করার দক্ষতা নিয়ে, আর বেশ কিছু আর্কিটেকচারের তথ্য জানি বলে। হস্টেলে গেলাম। ওনার কথা আমার মনে পড়ল না। কেউ যেন উঠোনটা ধুয়ে সাফ করে দিলো।

নির্মলদা এখন কেমন আছেন, সে খোঁজ একমাত্র উনিই দিতে পারবেন। কারণ, উনি এখন খাতার পাতায় রঙ বোলান না, ছাত্র শেখান না। 'প্ল্যান্টিং আর্ট সেন্টার'-এর বোর্ডটা আছে। ঝুলে পড়েছে। ধুলো জমে, জং ধরে প্রায় শেষ। ওনার এখন আঁকা শেখানোর ক্ষমতা নেই।

কিভাবেই বা থাকবে? সুইসাইড করার পর একটা মানুষ হাতে তুলি ধরবে কিভাবে?

নির্মলদা বেঁচে আছেন। আমার মধ্যে, অয়নদার মধ্যে, রুদ্রদার মধ্যে, বিটু-টুম্পাদির মধ্যে, রবির মধ্যে, তমালের মধ্যে। আমাদের অন্ধকার জগতে একরাশ আলো হয়ে। ঘন অন্ধকারে আমরা যখন পথ হারিয়ে ফেলি, নির্মলদা ঠিক আসেন, মাথায় হাত রাখেন, রঙের ঢেউয়ে ভেসে যায় সমস্ত অন্ধকার। হয়তো অনেকেই আমরা স্কেচ করি। চোখ থেকে টুপ টুপ করে অদৃশ্য জল পড়ে। সেই জল জলরঙ হয়ে পাতার বাইরে ছড়িয়ে পড়ে। উনি হাসেন। বলেন, 'আমি নেই তো কি আছে? তোদের মধ্যেই তো বীজ পুঁতে দিয়ে গেছি।' আলোয় আলোকময় হয় জগৎ। কেউ দেখতে পায় না ....।

এ কি লাবণ্যে পূর্ণ প্রাণ ....

অলঙ্করণ : সৌমেন মিত্র ও কৃষ্ণজিৎ সেনগুপ্ত